



অধ্যায় ১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

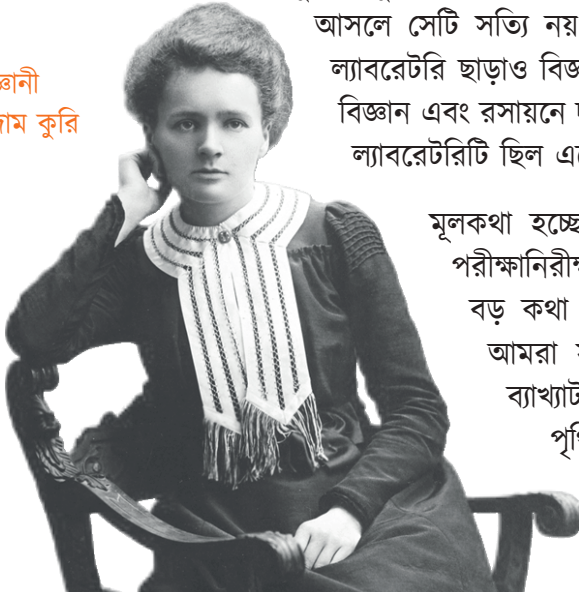
- ✓ বিজ্ঞানের ধারণা, প্রযুক্তির ধারণা
- ✓ বিজ্ঞান থেকে প্রযুক্তি
- ✓ ভালো প্রযুক্তি, খারাপ প্রযুক্তি
- ✓ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া
- ✓ বিভিন্ন রাশির পরিমাপ, বিভিন্ন ধরনের পরিমাপের পদ্ধতি
- ✓ ছোট ও বড় স্কেলে পরিমাপ
- ✓ প্রয়োজনে নিখুঁত পরিমাপ
- ✓ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা
- ✓ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা
- ✓ বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি

১.১ বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের কথা বলতেই আমাদের কল্পনায় বড় বড় আধুনিক ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের জটিল সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন, এরকম একটা ছবি ভেসে ওঠে। সেজন্য অনেকেই মনে করে বিজ্ঞানচর্চা বুঝি সবাই করতে পারে না, এর জন্য বুঝি অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকতে হয়, বিজ্ঞানী হতে হলে অনেক মেধাবী হতে হয়।

আসলে সেটি সত্যি নয়, বিজ্ঞান সবার জন্য। অনেক বড় আধুনিক ল্যাবরেটরি ছাড়াও বিজ্ঞানের গবেষণা করা যায়। মাদাম কুরি পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নে দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ল্যাবরেটরিটি ছিল একেবারেই সাদামাটা।

বিজ্ঞানী
মাদাম কুরি



মূলকথা হচ্ছে বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান যেটি সবসময় পরীক্ষানিরীক্ষা করে যাচাই করা যায়। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা বিজ্ঞান হচ্ছে চিন্তার একটা পদ্ধতি যেখানে আমরা সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করি এবং সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যাটাকেও যাচাই করে দেখি সেটি সত্যি কি না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর তত্ত্ব নিয়েও আমরা প্রশ্ন করতে পারি এবং সেটি সত্যি কি না

পরীক্ষা করে দেখতে পারি। হাজার হাজার বছর থেকে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বকে প্রতিনিয়ত যাচাই করে আসা হচ্ছে বলে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর কোনটা কতটুকু সত্যি সেটা আমরা জানি। যখন প্রয়োজন হয় তখন বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আমরা পরিবর্তন করি, কিংবা পরিমার্জন করি। সেজন্য বিজ্ঞানের উপর আমরা সবসময় নির্ভর করতে পারি।

বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান যেটি যুক্তিতর্ক, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষা দিয়ে যাচাই করতে পারি, কিন্তু মনে রাখবে যে, সব ধরনের জ্ঞানই কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নয়। আমাদের চারপাশে যে বাস্তব জগৎ আছে, সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। তাই ভালোবাসা, হিংসা বা নৈতিকতার মতো বিষয়গুলো নিয়ে যে জ্ঞানটুকু গড়ে উঠছে সেটি বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ঘটনা হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র।

১.১.১ দুজন বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান বিষয়টা সঠিকভাবে বোঝার জন্য এবারে দুজন বিজ্ঞানীর দুটি আবিষ্কারের কথা বলা যাক। একজন বিজ্ঞানীর নাম পৃথিবীর সবাই জানে আর অন্যজনকে দেখলে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে তিনি একজন বিজ্ঞানী, তার কথা জানে শুধু আমাদের দেশের অল্প কিছু মানুষ।



স্যার আইজাক নিউটন

স্যার আইজাক নিউটনের কথা কে না জানে, বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার রয়েছে কিন্তু এখানে তুলনামূলকভাবে একটি সহজ আবিষ্কারের কথা বলা যাক। তিনি বলেছিলেন, সূর্যের আলোকে আপাতত রংহীন মনে হলেও এটি আসলে অনেকগুলো রং দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানী নিউটন যে সময়ে বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন সেই সময়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সেরকম প্রচলন হয়নি। একজন বিজ্ঞানী কোনো তত্ত্ব দিলে সবাই মিলে সেটা নিয়ে আলোচনা করে বের করার চেষ্টা করতেন তত্ত্বটি সঠিক না ভুল।

বিজ্ঞানী নিউটন শুধু তাঁর তত্ত্ব দিলেন না, একটি প্রিজম দিয়ে সূর্যের আলোকে ভাগ করে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিশ্লেষণ করে দেখালেন। তিনি এটি করেই থেমে গেলেন না, আরেকটি প্রিজম দিয়ে সাতটি রংকে একত্র করে আবার বর্ণহীন করে দেখালেন!

পরীক্ষা করে একেবারে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেখানোর ফলে বিজ্ঞানী নিউটনের তত্ত্বটি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না।

হরিপদ কাপালী



হরিপদ কাপালী ছিলেন ঝিনাইদহ এলাকার একজন সাধারণ চাষি। তিনি তাঁর ক্ষেতে ইরি ধান লাগিয়েছেন, সেই ক্ষেতের ধান পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ করে দেখলেন, কিছু গাছ তুলনামূলকভাবে বড় এবং সেখানে ধানের ফলন হয়েছে বেশি। হরিপদ কাপালী একজন কৃষক হলেও তিনি আসলে বিজ্ঞানী, তাই সেই ধানগুলো অন্য ধানের সাথে মিশিয়ে না ফেলে সেগুলো আলাদা করে ফেললেন। তার বীজকে আলাদা করে করে সেগুলো আবার নতুন করে লাগালেন, তিনি দেখতে চাইলেন আসলেও সেগুলো উচ্চ ফলনশীল কিনা। দেখা গেলো সেগুলো বেশ বড় হলো এবং অনেক বেশি ধানের ফলন হলো।

খাঁটি বিজ্ঞানীরা স্বার্থপর হন না, তাঁরা সবার জন্য কাজ করেন। হরিপদ কাপালীও তাঁর ধানের বীজ অন্যদের বপন করতে দিলেন এবং দেখতে দেখতে সেই এলাকার সকল চাষি উচ্চ ফলনশীল ধান পেতে লাগল!

বিজ্ঞানী হরিপদ কাপালীর এই আবিষ্কারের কথা লোকমুখে অন্যরা জেনে যাওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করে। তাঁর ধানের নাম দেওয়া হয় হরি ধান, দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁকে পদক দিয়ে সম্মানিত করে এবং পাঠ্যবইতে তাঁর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা লেখা হয়।

তোমাদের এই দুজন বিজ্ঞানীর কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে বোঝানোর জন্য যে, বিজ্ঞান আসলে শুধু বড় বড় ল্যাবরেটরি এবং দক্ষ অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের জন্য নয়। একজন সাধারণ মানুষের যদি অনুসন্ধিৎসু মন থাকে তাহলে তিনিও বিজ্ঞানে অবদান রাখতে পারেন।

১.২ প্রযুক্তি

বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু যখন আমাদের জীবনের কোনো একটি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে বলে প্রযুক্তি। যেমন বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, পদার্থের ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় এবং এই বিদ্যুৎ আমাদের জীবনের অনেক প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের রূপপুরে সেরকম একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। আবার সেই একই জ্ঞান ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে দুবার সেটি সরাসরি মানুষের উপর ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞানের অপূর্ব একটি জ্ঞানকে

প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের ভালো কাজে যেরকম ব্যবহার করা যায়, ঠিক সেরকম মানুষকে ধ্বংস করার কাজেও ব্যবহার করা যায়।

বিজ্ঞান যেহেতু একটা জ্ঞান এবং চিন্তার একটা প্রক্রিয়া তাই বিজ্ঞানের মাঝে খারাপ কিছু থাকার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে যখনই কোনো একটা প্রযুক্তি গড়ে তোলা হয় সেটি কিন্তু যেরকম ভালো হতে পারে ঠিক সেরকম খারাপও হতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে তোমাদের সেরকম একটা উদাহরণ দিয়েছি, সেটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং নিউক্লিয়ার বোমা। ঠিক সেরকম জৈবরসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য ওষুধ তৈরি করা হয়, আবার সেই একই জ্ঞান ব্যবহার করে ভয়ানক মাদক তৈরি করা হয়, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধের উৎস।



নিউক্লিয়ার শক্তি ভালো, খারাপ
দুইরকম কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে

আমরা শুরুতে বলেছি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে প্রযুক্তি বলি, যদি তোমরা তোমাদের চোখ কান খোলা রাখো তাহলে দেখবে মাঝে মাঝে সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমাদের লাভ থেকে ক্ষতি বেশি হয়। যেমন পলিথিনের ব্যাগ—আমরা এই ব্যাগগুলো একবার ব্যবহার করে ফেলে দিই। এগুলো অপচনশীল বলে আবর্জনার সাথে সাথে শেষ পর্যন্ত নদীর তলদেশ বা প্রকৃতিতে আশ্রয় নেয়, প্রথমে দেশের তারপরে পৃথিবীর পরিবেশের মহাবিপর্ষয় ঘটতে থাকে। কিন্তু মানুষ যদি এর বদলে কাপড়ের বা চটের ব্যাগ ব্যবহার করতো তাহলে কিন্তু এই সর্বনাশ হতো না। কাজেই তোমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে একবার ব্যবহারের উপযোগী পলিথিনের ব্যাগের এই প্রযুক্তিটি আসলে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি।

আবার কিছু অসাধারণ চমৎকার প্রযুক্তি রয়েছে যেগুলো আমাদের জীবনযাত্রার মানের অনেক বড় পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু সেই একই প্রযুক্তি একজন মানুষ অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এমনকি ক্ষতিকর কাজেও ব্যবহার করতে পারে। তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ তোমাদের সবার চোখের সামনেই রয়েছে, সেটি হচ্ছে স্মার্টফোন। স্মার্টফোন কত কাজে লাগে সেটা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না কিন্তু মাঝে মাঝে দেখবে কোনো একজন মানুষ সম্পূর্ণ বিনা কারণে সেটি ব্যবহার করে নিজের সময় নষ্ট করছে। অপ্রয়োজনে ব্যবহার করে করে অনেক তরুণ-তরুণী নিজেদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ যে প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি হয়েছে, সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করেই মানুষের অকল্যাণ করা যায়, ক্ষতি করা যায়।

তাই প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়। বিজ্ঞান কখনো খারাপ হতে পারে না, কিন্তু প্রযুক্তি যদিও মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখেই তৈরি হয় কিন্তু সেটি ভালো হওয়ার পাশাপাশি খারাপও হতে পারে, অপ্রয়োজনীয় হতে পারে কিংবা তার অপব্যবহারও হতে পারে। কাজেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার আগে সবসময়ই এই ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

১.৬ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

এরিস্টটল



এরিস্টটল তাঁর সময়ের অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়কার জ্ঞানী ব্যক্তির শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সবকিছুই চর্চা করতেন। তাই এরিস্টটলের বিজ্ঞান নিয়েও অনেক তত্ত্ব ছিল। একটি তত্ত্ব ছিল ভারি আর হালকা বস্তু নিয়ে। এরিস্টটল বলেছিলেন ভারি আর হালকা বস্তু উপর থেকে ছেড়ে দিলে ভারী বস্তুটি আগে নিচে পড়বে। সেই সময় জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথাকে সবাই গুরুত্ব দিত তাই দুই হাজার বছর ধরে সবাই বিশ্বাস করত সেটাই সত্যি।

বিষয়টা একটু চিন্তা করলেই কিন্তু খটকা লাগে। যদি ভারি জিনিস দ্রুত এবং হালকা জিনিস ধীরে নিচে পড়ে তাহলে দুটি একসাথে বেঁধে দিলে হালকা জিনিসটা ভারি জিনিসটাকে আর দ্রুত পড়তে দেবে না। আবার দুটি জিনিস একসাথে বেঁধে দিলে মোট ওজন আরও বেশি বলে সেটার আরও দ্রুত পড়া উচিত। তাহলে কোনটা সত্যি? এই প্রশ্নের উত্তর কী?

যুক্তিতর্ক দিয়ে আমরা একটা উত্তর দাঁড় করতে পারি, যে আসলে ভারি আর হালকা সব বস্তুই একসাথে

নিচে পড়বে। কিন্তু আমরা তো সেটা ঘটতে দেখি না—একটা পাথর আর এক টুকরা কাগজ উপর থেকে ছেড়ে দিলে সবসময়ই পাথরটাই আগে নিচে পড়ে। আমরা সেটাও ব্যাখ্যা করার জন্য একটা যুক্তি দাঁড় করতে পারি—বলতে পারি বাতাসের বাধার কারণে কাগজের টুকরার পড়তে সময় বেশি লাগে। বায়ুশূন্য জায়গায় পরীক্ষাটা করতে পারলে দেখব দুটো একই সময় নিচে পড়ছে। কিন্তু বায়ুশূন্য জায়গা পাওয়া খুব সহজ নয়, তাই ভারি বস্তুর সাথে খুবই ছোট আকারের হালকা একটা বস্তু নিতে পারি যেন বাতাসের বাধা বেশি না হয়। কথিত আছে পিসার হেলানো দালানের উপর থেকে এরকম একটি ভারি আরেকটি হালকা বস্তু ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করে গ্যালিলিও দেখিয়েছিলেন যে, ভারি এবং হালকা বস্তু একসাথে নিচে পড়ে।

গ্যালিলিও



উপরের উদাহরণটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি

সুন্দর উদাহরণ। এখনও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিটা একই আছে। এখানে মোট ছয়টি ধাপ রয়েছে, ধাপগুলো এরকম:

১। একটি প্রশ্ন যার উত্তর বের করতে হবে।

(উপরের উদাহরণে সেই প্রশ্নটি হচ্ছে ভারি না হালকা বস্তু কোনটা আগে নিচে পড়বে?)

২। এ সম্পর্কে যা কিছু গবেষণা হয়েছে তা জেনে নেওয়া।

(উপরের উদাহরণে সেটি ছিল এরিস্টটলের ব্যাখ্যা।)

৩। প্রশ্নটির একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো।

(উপরের উদাহরণের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে ভারি এবং হালকা দুটিই বস্তুই একসাথে নিচে পড়বে।)

৪। সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি সত্যি কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখা।

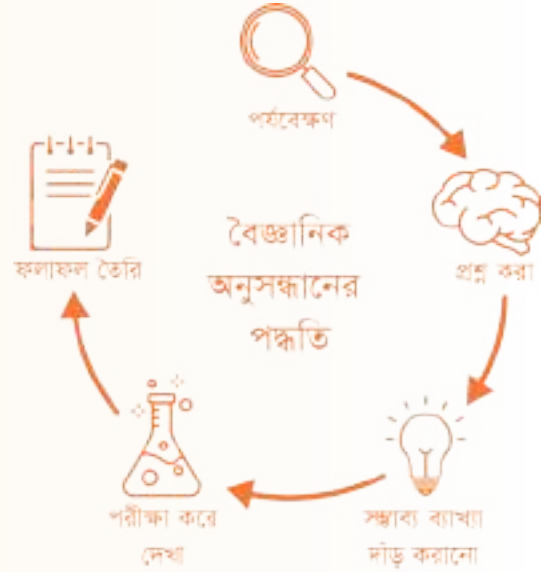
(উপরের উদাহরণে গ্যালিলিও সেটি পিসার হেলানো দালানের উপর থেকে ভারি এবং হালকা বস্তু ফেলে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন।)

৫। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া।

(উপরের উদাহরণে গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁর ধারণা সঠিক।)

৬। সবাইকে ধারণাটি জানিয়ে দেওয়া।

(গ্যালিলিও তার ধারণাটি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তখন অন্যরাও পরীক্ষাটি করে দেখেছিলেন।)



তোমরা যদি ইতিহাসের বড় বড় বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো দেখো তাহলে দেখবে, সবসময়ই সেগুলো ঘটেছে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে। আবার তোমাদের চারপাশের দৈনন্দিন ঘটনাগুলোর জন্যও কিন্তু এটা সত্যি, তোমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর এভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করেই পেয়ে যাবে।

মূলকথা হচ্ছে, বিষয়টা যদি বিজ্ঞানের বিষয় হয় তাহলে তার উত্তরটি চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়া নয়; সেটি যাচাই করে গ্রহণ করা হচ্ছে বিজ্ঞান। সবাই হয়ত বিজ্ঞানী হবে না কিন্তু সবাই বিজ্ঞানমনস্ক হবে।

১.৪ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ

তোমরা এর মাঝে জেনে গেছো যে বিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি জ্ঞান যার ক্ষেত্র হচ্ছে প্রকৃতি কিংবা প্রাকৃতিক ঘটনা এবং বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব সত্যি কিনা সেটি যখন খুশি যাচাই করে দেখা যায়। এটি যাচাই করার জন্য যে পদ্ধতিটি সবচেয়ে কার্যকর সেটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ। যখনই কোন একজন বিজ্ঞানী একটি বিজ্ঞানের তত্ত্ব দেন তখন সাথে সাথে অন্য বিজ্ঞানীরা সেই তত্ত্বটি সত্যি কিনা সেটা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেন। তোমরা ল্যাবরেটরিতে যে অসংখ্য যন্ত্রপাতি দেখো তার সবই এরকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সেজন্য সবসময়ই বলা হয়ে থাকে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান কখনও একা একা অগ্রসর হতে পারে না, এ দুটো সবসময় একে অন্যের হাত ধরে মূল বিজ্ঞানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আবার মহাকাশ বিজ্ঞান কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্র আছে যেগুলো সরাসরি ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ করে দেখা সম্ভব নয়, তখন বিজ্ঞানীরা শুধু পর্যবেক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকেন। সেই পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনেক সূক্ষ্ম কিংবা জটিল যন্ত্র তৈরি করে সেগুলো ব্যবহার করে অনেক কিছু পরিমাপ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণই হোক আর পর্যবেক্ষণই হোক সেগুলো সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য আমাদের অনেকগুলি রাশিকে সুনির্দিষ্ট করে নিতে হয়েছে, পরের পরিচ্ছেদে তোমাদেরকে সেরকম কয়েকটি রাশির এককের কথা বলা হয়েছে।

১.৪.১ বিভিন্ন রাশির পরিমাপ

একটা পাথর উপরে ছুড়ে দিলে একসময় তা আবার নিচে এসে পড়ে। মানুষ প্রাচীনকাল থেকে এটা দেখে আসছে। কিন্তু এই জ্ঞানটুকু পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বলতে পারবে না যে—ঠিক কত জোরে কত ওজনের একটা পাথর কোন দিকে ছুড়ে দিলে কত সময়ে কত উপরে উঠে তা কত দূরে গিয়ে পড়বে। তার অর্থ প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা করতে গেলে আমাদের সবকিছু পরিমাপ করে বলতে হয়।

যে সমস্ত বিষয় আমরা পরিমাপ করতে পারি সেগুলোকে রাশি বলে। কাজেই জ্বর ওঠার পর তোমার যে তাপমাত্রা বেড়ে যায় সেটি হচ্ছে একটা রাশি, কিন্তু জ্বর ওঠার কারণে তোমার শরীরে যে খারাপ অনুভূতি হয় সেটি রাশি নয়। ঠিক সেরকম একটা রসগোল্লা ভর হচ্ছে রাশি, কিন্তু রসগোল্লা খাওয়ার আনন্দ রাশি নয়। কাজেই তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে, বিজ্ঞানচর্চা করতে হলে আমাদের অনেক রাশি পরিমাপ করতে হবে। রাশিগুলো পরিমাপ করার জন্য আমাদের সঠিক একক তৈরি করে নিতে হবে, যেমন দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার, সেন্টিমিটার বা কিলোমিটার; ভরের জন্য কেজি কিংবা পাউন্ড ইত্যাদি। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে রাশি কতগুলো আছে? তাদের জন্য কতগুলো একক লাগবে? আমরা যদি কিছু রাশির কথা কল্পনা করতে চাই, তাহলে এক নিশ্বাসে বলে দিতে পারব দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আয়তন, ওজন, ঘনত্ব, অবস্থান, বেগ, চাপ, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, তাপ পরিবাহিতা, রং, কাঠিন্য—অর্থাৎ রাশির কোনো শেষ নেই। সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের একক কয়টি লাগবে?

আনন্দের কথা হচ্ছে আমাদের চারপাশের জগতে অসংখ্য রাশি থাকলেও সেগুলো ব্যাখ্যা করতে মাত্র সাতটি রাশির জন্য সাতটি একক তৈরি করে নিলে সেগুলোকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের সব রাশি তৈরি করে ফেলতে পারব। সেই সাতটি রাশির চারটি তোমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিন ব্যবহার করো, সেগুলো হচ্ছে দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এবং তাপমাত্রা। (অন্য তিনটি হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ, পদার্থের পরিমাপ, আলোর গুণ্জ্বল্য, আরেকটু উপরের ক্লাসে তোমরা সেগুলো সম্পর্কেও জানবে।) পরিমাপের জন্য এককগুলো আন্তর্জাতিকভাবে সবাই মিলে ঠিক করে রেখেছে। যদিও বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন একক প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত SI ইউনিটগুলো এরকম: দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার (m), ভরের জন্য কিলোগ্রাম বা কেজি (kg), সময়ের জন্য সেকেন্ড (s), তাপমাত্রার জন্য কেলভিন (K)। আমরা এবারে প্রচলিত এই চারটি এককের পরিমাপ নিয়ে আর একটু আলোচনা করি।

১.৪.২ পরিমাপের পদ্ধতি

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ঠিকভাবে পরিমাপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ কিলোমিটার হাঁটতে গিয়ে যদি দেখো তোমাকে পাঁচ মাইল হাঁটতে হচ্ছে তাহলে দেড়গুণ থেকে বেশি হাঁটতে হবে। তোমার মা যদি তোমাকে পাঁচ কেজি চাল আনতে বলে আর তুমি যদি পাঁচ পাউন্ড চাল নিয়ে আস, তাহলে অর্ধেক থেকেও কম চাল আনবে! দৈনন্দিন জীবনে এরকম ভুলত্রুটি আমরা কোনোভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই ভুল মারাত্মক হতে পারে। পরিমাপে ভুল করেছিল বলে ১৯৮৩ সালের ২৩শে

জুলাই এয়ার কানাডার যাত্রীবাহী একটি বোয়িং ৭৬৭ বিমান মাঝপথে আবিষ্কার করল তার জ্বালানি শেষ। বিন্দুমাত্র জ্বালানি ছাড়াই দক্ষ পাইলট সেটিকে কাছাকাছি পরিত্যক্ত একটা রেস কোর্সে নামিয়ে আনতে পেরেছিল। আবার একই ধরনের পরিমাপের হেরফেরের কারণে নাসার (NASA) ১২৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি মহাকাশযান ১৯৯৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মঙ্গল গ্রহে বিধস্ত হয়েছিল। কাজেই পরিমাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।



১৯৮৩ সালের ২৩শে জুলাই এয়ার কানাডার যাত্রীবাহী বোয়িং ৭৬৭ বিমানের জ্বালানি হঠাৎ শেষ হয়ে যাবার পর পাইলট দক্ষ হাতে কোনো হতাহত ছাড়াই বিমানটিকে মাটিতে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন

এবারে আমরা আমাদের পরিচিত চারটি এককের বিজ্ঞানে ব্যবহারের উপযোগিতা দেখি।

দৈর্ঘ্য



দৈর্ঘ্যের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে মিটার, সংক্ষেপে m। যদিও পাশাপাশি ইঞ্চি এবং ফুটকে দৈনন্দিন জীবনে এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আমরা বিজ্ঞানের পরিমাপের জন্য এই বইয়ে মিটারকে দৈর্ঘ্যের একক হিসেবে ব্যবহার করব। তোমরা যারা একটা মিটারস্টিক হাতে নিয়েছ, তারা মিটার বলতে কতটুকু দূরত্ব বোঝায় সেটা অনুভব করতে পেরেছ।

মোটামুটিভাবে বলা যায় একজন মানুষের পা থেকে কোমর পর্যন্ত দূরত্বটুকুই হচ্ছে এক মিটার। তবে একেবারে সঠিকভাবে এক মিটার দূরত্ব মাপার জন্য আগে একটি আদর্শ মিটারস্টিক ফ্রাগের একটি মিউজিয়ামে রাখা ছিল। এখন এক মিটার দূরত্ব মাপার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি মজার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আলোর বেগ অনেক বেশি, এটি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অচিন্তনীয় আলোর বেগ ব্যবহার করে এক মিটার দূরত্ব বের করে ফেলেন। (তোমরা যখন একটু উপরের ক্লাসে উঠবে তখন সেটি কীভাবে করা যায় জানতে পারবে।) আলোর বেগ যেহেতু মহাবিশ্বের সব জায়গায় একই থাকে, তাই শুধু পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় নয় মহাবিশ্বের যে কোনো জায়গায় এক মিটার দূরত্ব কতটুকু সেটা অনেক সূক্ষ্মভাবে বের করে ফেলা যাবে।

তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঢাকা থেকে সিলেট কতদূর তাহলে তুমি দূরত্বটি মিটারে না দিয়ে কিলোমিটারে দেবে, এক কিলোমিটার হচ্ছে ১০০০ মিটার। ঠিক সেরকম যদি তোমাকে তোমার নখের দৈর্ঘ্য কত জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি সেই দৈর্ঘ্যটি মিটারে না বলে মিলিমিটারে বলবে, মিলিমিটার হচ্ছে এক মিটারের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। মিলিমিটারের পাশাপাশি সেন্টিমিটারও ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। এক সেন্টিমিটার হচ্ছে এক মিটারের ১০০ ভাগের ১ ভাগ কিংবা ১০ মিলিমিটার। মিলিমিটারের চাইতেও ছোট দৈর্ঘ্যের জিনিস সাধারণত আমাদের খালি চোখে মাপজোখ করতে হয় না।

কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তোমাকে যদি কোনো একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য বলতে হয় তাহলে তোমাকে বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক করতে হবে দূরত্বটি মিটারে বলবে নাকি কিলোমিটারে বলবে কিংবা সেন্টিমিটারে বলবে নাকি মিলিমিটারে বলবে। সত্যি কথা বলতে কি তোমরা যখন মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্র নিয়ে পড়বে তখন দেখবে আমাদের এর বাইরেও কাজের সুবিধার জন্য অন্য একটা একক ব্যবহার করতে হচ্ছে!

ভর



ভরের একক হচ্ছে কিলোগ্রাম বা সংক্ষেপে কেজি (kg)। এক সময় ‘আসল’ এক কেজি একটা ভর ফ্রাগের একটি মিউজিয়ামে রাখা হতো। ২০১৯ সালের মে মাস থেকে ‘আদর্শ’ বা ‘আসল’ এককের জন্য কোনো মিউজিয়ামে রক্ষা করা ভরের উপর নির্ভর করতে হয় না। বিজ্ঞানের কিছু ধ্রুব থেকে সেগুলো বের করে ফেলা যায়।

সম্ভবত আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি বার কেজি

ব্যবহার করি। যেহেতু আমরা আজকাল পানি কিংবা সফট ড্রিন্কেস বোতলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই বলতে পারি এক লিটারের বোতল বোঝাই পানি কিংবা সফট ড্রিন্কেস ভর হচ্ছে এক কেজি। কিংবা সাধারণ গ্লাসের চার গ্লাস পানির ভর হচ্ছে এক কেজি।

তোমাদের কারো কারো মনে হয়ত খটকা লাগছে যে আমরা ওজন মাপার জন্য কেজি ব্যবহার করি, আমাদের ওজন ৩০ কেজি বলতে আমরা খুবই অভ্যস্ত, তাহলে প্রচলিত ওজন শব্দটা ব্যবহার না করে বার বার ভর কথাটা কেন ব্যবহার করছি?

তার কারণটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের ভাষায় ভর আর ওজনের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য। ভরের একক হচ্ছে কেজি। ওজনের অন্য একটি একক, তোমরা উপরের ক্লাসে সেগুলো জানবে। কাজেই বিজ্ঞানের ভাষায় তোমার ওজন ৩০ কেজি কথাটি ভুল, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না! এক ভর অন্য ভরকে আকর্ষণ করে; পৃথিবীর ভর যেহেতু অনেক বেশি তাই তার আকর্ষণটাও বেশি, এই আকর্ষণটাই আসলে ওজন। চাঁদের ভর যেহেতু পৃথিবীর ভর থেকে কম তাই তুমি যদি চাঁদে যাও তাহলে দেখবে সেখানে তোমার উপর চাঁদের আকর্ষণও কম। অর্থাৎ তোমার মনে হবে তোমার ওজনও কম, এক লাফে তুমি অনেক উপরে উঠে যেতে পারবে। কাজেই পৃথিবী এবং চাঁদ দুই জায়গাতেই তোমার ভর ৩০ কেজি হলেও পৃথিবী এবং চাঁদে তোমার ওজন ভিন্ন!

দৈর্ঘ্যের বেলায় দেখেছি মিটারের পাশাপাশি ইঞ্চি এবং ফুটও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভরের জন্যও কেজির পাশাপাশি পাউন্ড ব্যবহার হতো তবে আজকাল সেটি তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহৃত হয়। দৈর্ঘ্যের বেলাতে আমরা কম কিংবা বেশি দূরত্ব বোঝানোর জন্য সেন্টিমিটার বা কিলোমিটার ব্যবহার করেছি, ভরের বেলাতেও তাই। কম ভরের বেলায় আমরা গ্রাম (g) ব্যবহার করি যেটা কিলোগ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। তার চাইতেও কম ভর মাপার জন্য আমরা মিলিগ্রাম (mg) ব্যবহার করি যেটা গ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। তোমরা ওষুধের ট্যাবলেটে দেখবে সেখানকার সক্রিয় উপাদানটির পরিমাণ সবসময় mg-এ দেওয়া থাকে।

সময়



যতগুলো রাশি আছে তার মধ্যে সময় রাশিটি নিশ্চয়ই আমাদের পরিচিত রাশি। এর মূল এককটি নিয়ে পৃথিবীতে কোনো বিভাজন নেই। সবাই সেকেন্ডকে (s) সময়ের একক হিসেবে মেনে নিয়েছে। খাঁটি বিজ্ঞানের বেলায় এক সেকেন্ড ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরমাণুর নির্দিষ্ট সংখ্যক কম্পনের সময়কে ধরে নিলেও আমরা মুখে ‘এক হাজার এক’ কথাটি উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে এক সেকেন্ড হিসেবে অনুভব করতে পারি। দৈর্ঘ্য এবং ভরের বেলায় কিলোমিটার এবং

কিলোগ্রাম থাকলেও সময়ের বেলায় কিলোসেকেন্ড নেই! তোমরা সবাই জানো ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট এবং ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা ধরে নেওয়া হয়। তবে কিলোসেকেন্ড না থাকলেও মিলিসেকেন্ড আছে। সেটি হচ্ছে ১ সেকেন্ডের ১০০০ ভাগের এক ভাগ, তবে এই সময়টি

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করার জন্য বেশ ছোট।

আমাদের চারপাশে ১ সেকেন্ডের কাছাকাছি অনেক উদাহরণ আছে। আমাদের হৃৎস্পন্দন সেকেন্ডে ১ বার করে হয়, কারো একটু বেশি, কারো একটু কম। আমরা চোখের পাতা ফেলি প্রতি দুই সেকেন্ডে একবার, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম। নিশ্বাস নেই প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একবার, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম!

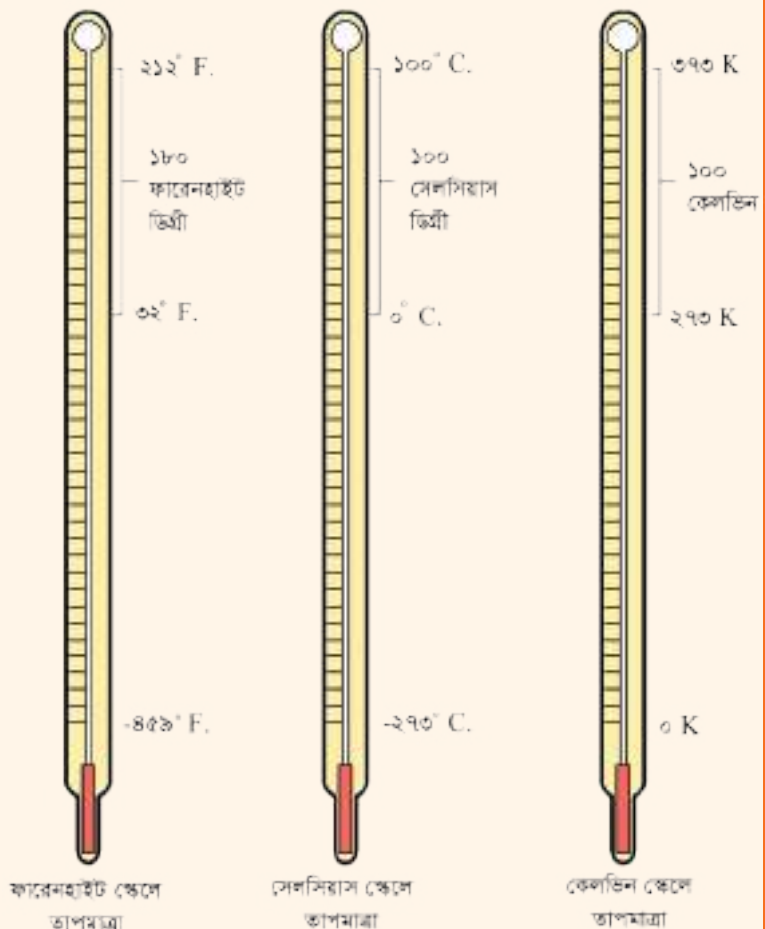
তাপমাত্রা



আমরা সবাই কখনো না কখনো বলেছি ‘গরম লাগছে’ কিংবা ‘ঠান্ডা লাগছে’। আমরা এটাও জানি চা গরম এবং আইসক্রিম ঠান্ডা; গরম এবং ঠান্ডা কথাটি দিয়ে আমরা আসলে বোঝাই ‘তাপমাত্রা’ নামক রাশিটি তুলনামূলকভাবে বেশি বা কম। কাজেই আমরা আসলে তাপমাত্রাটি আমাদের শারীরিক অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি, অবশ্যই যদি সেটা

আমাদের সহ্য ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে কেলভিন (K), যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কখনো ব্যবহার করি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা তাপমাত্রার জন্য যে এককটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে সেলসিয়াস ($^{\circ}\text{C}$)। এই এককে পানি জমে বরফ হওয়ার তাপমাত্রা ধরা হয়েছে 0°C এবং পানি ফুটে বাষ্প হওয়ার তাপমাত্রা ধরা হয়েছে 100°C । তবে মজার বিষয় হচ্ছে কেলভিন এককের বেলাতেও পানি বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা



এবং বরফের তাপমাত্রার পার্থক্য 100K ।

অর্থাৎ কোনো কিছুর তাপমাত্রা 10°C বেড়ে গিয়েছে বলা যে কথা 10K বেড়ে গিয়েছে বলা একই কথা। স্বাভাবিকভাবেই তুমি তাহলে প্রশ্ন করতে পার এই দুটি এককের মধ্যে পার্থক্য কী?

পার্থক্য হচ্ছে 273.15° !

অর্থাৎ সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রার সাথে 273.15 যোগ করলে কেলভিন স্কেল পাওয়া যায়। অর্থাৎ কেলভিন স্কেলে বরফের তাপমাত্রা হচ্ছে $0 + 273.15 = 273.15\text{ K}$ এবং পানি বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা হচ্ছে $100 + 273.15 = 373.15\text{ K}$ ।

স্বাভাবিকভাবেই তুমি তাহলে প্রশ্ন করবে সেলসিয়াসের এত সহজ সরল স্কেলের সাথে এই বিচিত্র একটি সংখ্যা যোগ দিয়ে কেলভিন স্কেল তৈরি করার কারণ কী?

কারণটি কিন্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ। তুমি যে কোনো কিছুর তাপমাত্রা যত ইচ্ছা বাড়াতে পারবে, তার কোনো সীমা নেই! কিন্তু তাপমাত্রা যত ইচ্ছা কমাতে পারবে না। তাপমাত্রার একটা সর্বনিম্ন মান আছে। সত্যি কথা বলতে কী তুমি এই তাপমাত্রার কাছাকাছি যেতে পারবে কিন্তু কখনই সেই তাপমাত্রায় পৌঁছাতে পারবে না। এটাকে বলে পরম শূন্য তাপমাত্রা। কেলভিন স্কেলটি তৈরি করা হয়েছে এই তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে। সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রা হচ্ছে -273.15° তাই সেলসিয়াস স্কেলের সাথে 273.15 যোগ দিলে কেলভিন স্কেল পাওয়া যায়।

যাই হোক, সেলসিয়াস স্কেলের পাশাপাশি ফারেনহাইট নামে আরও একটি তাপমাত্রা স্কেল কোনো কোনো দেশে এবং জ্বর মাপার থার্মোমিটারে ব্যবহার করা হয়। সেই স্কেলে বরফের তাপমাত্রা 32°F এবং ফুটন্ত পানির তাপমাত্রা 212°F । ফারেনহাইট স্কেলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.6°F সেলসিয়াসে যেটা 37°C ।

১.৪.৩ মৌলিক একক এবং যৌগিক একক

আমরা দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এবং তাপমাত্রা এই চারটি রাশি পরিমাপ করার জন্য এককের কথা বলেছি। সেগুলো হচ্ছে মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড এবং কেলভিন। এগুলো হচ্ছে মৌলিক একক। কাজেই আমরা যদি কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মাপি তাহলে শুধু মৌলিক একক মিটার দিয়ে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যদি একটা ঘরের ক্ষেত্রফল মাপতে চাই তাহলে সেটা মৌলিক একক মিটার দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। ঘরটির দৈর্ঘ্য যদি ৫ মিটার এবং প্রস্থ ২ মিটার হয় তাহলে ঘরটির ক্ষেত্রফল,

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} = ৫ \text{ মিটার} \times ২ \text{ মিটার} = ১০ \text{ বর্গমিটার}$$

যেহেতু এককটি ‘বর্গমিটার’ তাই সেটাকে আমরা বলব যৌগিক একক। ঠিক একটা গাড়ি যদি ৩

সেকেন্ডে ১৫ মিটার যায় তাহলে তার বেগ হচ্ছে,

$$\text{বেগ} = 15 \text{ m} / 3 \text{ s}$$

$$= 5 \text{ m/s}$$

প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার বা ৫ m/s।

এবারের এককটি হচ্ছে মিটার/সেকেন্ড, এটিও দুটি ভিন্ন একক দিয়ে তৈরি হয়েছে। কাজেই এটা হচ্ছে যৌগিক একক।

সন্ধাননী ?

১। তোমরা নিশ্চয়ই পিঁপড়াকে সারি বেঁধে যেতে দেখেছ। সারিটি ভেঙে দিলেও কিছুক্ষণের ভেতর পিঁপড়ারা আবার তাদের সারিটি তৈরি করে ফেলে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি ব্যবহার করে তোমরা কি বের করতে পারবে পিঁপড়া কীভাবে এটি করে?

২। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ছয়টি ধাপের মাঝে কোনটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়? কেন?

৩। বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানমনস্ক এই দুইটির মাঝে পার্থক্য কী?

৪। ধরা যাক চাঁদে তুমি একটা মুদির দোকান দেবে। সেই দোকানে বেচা-কেনা করার জন্য তুমি কি দাড়িপাল্লা ব্যবহার করবে নাকি স্প্রিং ব্যালেন্স ব্যবহার করবে? কেন?

৫। লম্বা সুতা দিয়ে ছোট একটা পাথর ঝুলিয়ে সেটা দুলতে কত সময় নেয় বের করো। এখন সুতার দৈর্ঘ্য এবং পাথরের ভর বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দোলনের সময় বের করে দেখ সেটার কি কোনো পরিবর্তন হয়?

৬। $T_F = (T_C \times 9)/5 + 32$ তুমি এই সূত্র ব্যবহার করে সেলসিয়াসে তাপমাত্রা (T_C) দেওয়া থাকলে সেটি ফারেনহাইটে (T_F) কত হবে বের করতে পারবে। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট দুই স্কেলেই তার মান সমান, সেটি কত বের করতে পারবে?